৫

যৌথ দরকষাকষি
Collective Bargaining

যৌথ দরকষাকষি শিল্পবিরোধ নিষ্পত্তি করার অন্যতম পদ্ধতি। যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে বিরোধী পক্ষগণের মধ্যে আলোচনা ও মতবিনিময় হয় এবং তারা একটা নিষ্পত্তি চুক্তিতে উপনীত হয়। এই ইউনিটে যৌথ দরকষাকষি সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা দেওয়া হয়েছে। এটি জানার পর ব্যবসায় প্রশাসনের শিক্ষার্থীরা শিল্পবিরোধের সুষ্ঠু নিষ্পত্তি করার জন্য যৌথ দরকষাকষি পদ্ধতি কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় দুই সপ্তাহ
এ ইউনিটের পাঠসমূহ	
পাঠ- ৫.১ : যৌথ দরকষাকষি: প্রকৃতি	

পাঠ ৫.১ যৌথ দরকষাকষি: প্রকৃতি
Collective Bargaining: Nature

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- যৌথ দরকষাকষি কাকে বলে তা বলতে পারবেন;
- যৌথ দরকষাকষির বৈশিষ্ট্যাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- যৌথ দরকষাকষির আওতা বর্ণনা করতে পারবেন;
- যৌথ দরকষাকষির পর্যায়গুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- যৌথ দরকষাকষি সফল করার শর্তাবলি বর্ণনা করতে পারবেন;
- যৌথ দরকষাকষিতে অংশগ্রহণ কীভাবে করতে হবে তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- যৌথ দরকষাকষির পন্থা বর্ণনা করতে পারবেন;
- যৌথ দরকষাকষি এজেন্টের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বিভিন্ন দেশের যৌথ দরকষাকষি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- যৌথ দরকষাকষির বর্তমান ধারা বর্ণনা করতে পারবেন।

যৌথ দরকষাকষি শিল্প-বিরোধ নিষ্পত্তি করার অন্যতম পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি অর্থাৎ যৌথ দরকষাকষি এজেন্ট বা শ্রমিকসংঘ শ্রমিকদের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে আসে। এ কারণে ব্যবসায় প্রশাসনের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর যৌথ দরকষাকষি সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। এ লক্ষ্যে এই পাঠে যৌথ দরকষাকষি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে আমরা যৌথ দরকষাকষির সংজ্ঞা নিয়ে কথা বলব।

যৌথ দরকষাকষির সংজ্ঞা
Definition of Collective Bargaining

যৌথ দরকষাকষি হলো শিল্প-বিরোধ নিষ্পত্তি ও উন্নত শিল্প-সম্পর্ক সৃষ্টির একটি পদ্ধতি। এটি একটি প্রক্রিয়া যার অধীনে মালিক ও শ্রমিকপ্রতিনিধিরা একত্রে বসে শ্রমিক স্বার্থ সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে কোনো চুক্তি বা সন্ধির লক্ষ্যে আলোচনা করে। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, মালিকপক্ষ বা নিয়োগকর্তার সঙ্গে শ্রমিক কর্মচারীদের চাকুরি সংক্রান্ত বিষয় যেমন: চাকুরির শর্তাবলি, বেতন ও মজুরি, কাজের পরিবেশ, নিয়োগ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে শ্রমিকদের কোনো বিরোধ দেখা দিলে তার নিষ্পত্তির জন্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে শ্রমিক প্রতিনিধির বোঝাপড়াকে যৌথ দরকষাকষি বলা হয়। যৌথ দরকষাকষি নিয়ে কয়েকটি বিশেষজ্ঞ সংজ্ঞা নিচে দেওয়া হলো:

যৌথ দরকষাকষি হলো একজন নিয়োগকারী বা একদল নিয়োগকারী ও একদল কর্মীর মধ্যে কাজের পরিবেশ নিয়ে একটা চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য আলাপ-আলোচনা। **-এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা**। [Collective bargaining is negotiation between an employer or group of employers and a group of work people to reach an agreement on working conditions.]

যৌথ দরকষাকষি হলো কাজের অবস্থা ও চাকুরির শর্তাবলি সম্পর্কে চুক্তিতে পৌঁছানোর একটি আলাপ-আলোচনা; যার একদিকে থাকে একজন নিয়োগকারী, একদল নিয়োগকারী বা এক বা একাধিক নিয়োগকারীদের সংগঠন আর অন্য দিকে থাকে প্রতিনিধিত্বকারী এক বা একাধিক শ্রমিকসংগঠন। **-আই.এল.ও.ওয়ার্কার্স ম্যানুয়াল (১৯৭৩)**। [Collective

bargaining is a negotiation about working conditions and terms of employment between an employer, a group of employers or one or more employer's organizations on the one hand and one or more representative worker organizations on the other hand with a view to reaching agreement.]

যৌথ দরকষাকষি হলো একটি প্রক্রিয়া; যা দ্বারা মজুরি, কার্যঘণ্টা, কার্যপরিবেশ ও সমজাতীয় বিষয়ে একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তিতে উপনীত হয়; যেটি শ্রমিক-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কের একটি মুখ্য উপাদান। **-ফ্রেঞ্চ** (১৯৯৭) [Collective bargaining, the process by which a formal agreement is established between worker and management regarding wages, hours, working conditions and similar matters, is a key aspect of labour –management relations.]

যৌথ দরকষাকষি হলো একটি প্রক্রিয়া; যার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকসংঘের প্রতিনিধিরা একটি শ্রম চুক্তি সম্পাদন করার জন্য আলাপ আলোচনায় মিলিত হয়। **-ডেজলার** (২০০২) [Collective bargaining is the process through which representatives of management and the union meet to negotiate a labour agreement.]

উপরের বর্ণনা থেকে দেখা যাচ্ছে, যৌথ দরকষাকষি দুইটি পক্ষের বিরোধ নিষ্পত্তির একটা সমঝোতা প্রক্রিয়া। এখানে তৃতীয় কোনো পক্ষের হস্তক্ষেপ ছাড়া বিরোধী পক্ষগণ নিজেরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মিটানোর চেষ্টা করে। তবে, আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে মজুরি, চাকুরির কার্যকাল, নিয়োগ শর্তাবলি, কার্যপরিবেশ ও অন্যান্য শ্রমিক স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়াবলি। এ জন্য বলা যায়, যৌথ দরকষাকষি হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকসংঘের প্রতিনিধিরা একটি শ্রম চুক্তি সম্পাদন করার জন্য আলাপ আলোচনায় মিলিত হয়। অন্য কথায়, যৌথ দরকষাকষি শ্রমিক ও নিয়োগকারীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংঘের সম্মিলিত অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও বিরোধ নিষ্পত্তির একটা মাধ্যম যেখানে মালিক ও শ্রমিকপক্ষ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অর্জিত যৌথ চুক্তির ব্যাখ্যা নিশ্চিত করে। এছাড়া, শিল্প-সম্পর্ক প্রশাসন, মজুরি, নিয়োগের কার্যকাল, নিয়োগ শর্তাবলি নিয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, যৌথ দরকষাকষি একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মতপার্থক্য নিরসন করে সম্মতি ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যম মজুরি, কাজের অবস্থা ও চাকুরির শর্তাবলি সম্পর্কে একটি সমঝোতামূলক চুক্তিতে উপনীত হওয়া যায়।

এবার আমরা যৌথ দরকষাকষির বৈশিষ্ট্যবলি বর্ণনা করব।

যৌথ দরকষাকষির বৈশিষ্ট্যসমূহ

Features of Collective Bargaining

যৌথ দরকষাকষি একটা বিশেষায়িত কাজ। এ জন্য এই যৌথ দরকষাকষির কতকগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। এগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১। **যৌথ দরকষাকষি একটা প্রক্রিয়া:** আমরা জানি পর্যায়ক্রমে সংঘটিত কাজের ধারাকে প্রক্রিয়া বলে। যৌথ দরকষাকষি কার্যসম্পাদনের জন্য পর্যায়ক্রমে কতকগুলো কাজ করতে হয়। যেমন: এক পক্ষ কর্তৃক শিল্প-বিরোধ অনুধাবন-অপর পক্ষের কাছে শিল্প-বিরোধ লিখিতভাবে উত্থাপন; সমঝোতায় বসার জন্য সময় ও স্থান নির্বাচন এবং আলোচনায় বসা ইত্যাদি কাজ পর্যায়ক্রমে সম্পাদিত হতে হয়। এ কারণে যৌথ দরকষাকষি একটা প্রক্রিয়া।

২। **যৌথ দরকষাকষি একটা দলগত প্রক্রিয়া:** যৌথ দরকষাকষিতে দুইটি দল অংশগ্রহণ করে। একটা দল হলো ব্যবস্থাপনা বা মালিকের প্রতিনিধিগণ; আর অন্য দল হলো শ্রমিকদের প্রতিনিধিগণ। এ কারণে যৌথ দরকষাকষি একটা দলগত প্রক্রিয়া হিসেবে অভিহিত।

৩। **যৌথ দরকষাকষির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা জড়িত:** যৌথ দরকষাকষিতে শিল্প-বিরোধের পক্ষগণ সমঝোতায় আসার জন্য নানা উপায় বের করার চেষ্টা করে। এ জন্য পক্ষগণের মধ্যে গঠনমূলক আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে ও এক সময় সবার কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধানে উপনীত হওয়া যায়।

৪। **যৌথ দরকষাকষি একটা দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থা:** যৌথ দরকষাকষিতে প্রধানত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দুইটি পক্ষ আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত হয়। এক দিকে মালিকপক্ষ, আর অন্য দিকে শ্রমিকপক্ষ। এই দুই পক্ষ যৌথ দরকষাকষি করে

বলে যৌথ দরকষাকষি একটা দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত। তবে, বিশেষ ক্ষেত্রে বহুপাক্ষিক যৌথ দরকষাকষি হতে পারে।

৫। **যৌথ দরকষাকষির বিষয় শ্রমিক স্বার্থ:** শিল্প-বিরোধ শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যে সংঘটিত হয়। এ ক্ষেত্রে যৌথ দরকষাকষির বিষয় শ্রমিক স্বার্থ; অর্থাৎ, মজুরি, কার্যপরিবেশ, কাজের সময় , সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পক্ষগণের মধ্যে যৌথ দরকষাকষি হয়।

৬। **যৌথ দরকষাকষির উদ্দেশ্য হলো সমঝোতামূলক চুক্তি:** যৌথ দরকষাকষিতে নিয়োজিত পক্ষগণের স্বাভাবিক উদ্দেশ্য থাকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতামূলক চুক্তি করা এবং শিল্পে শান্তি বজায় রাখা।

৭। **যৌথ দরকষাকষি আর্থসামাজিক প্রক্রিয়া:** শিল্প-বিরোধের যে সকল বিষয় নিয়ে যৌথ দরকষাকষি করা হয় তার মধ্যে আর্থিক বিষয়টি প্রধান। তবে, শ্রমিকদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়ে থাকে। যেমন: মূল্যবোধ, সামাজিক স্বীকৃতির প্রত্যাশা পূরণ ইত্যাদি সামাজিক বিষয়ও যৌথ দরকষাকষিতে স্থান পায়। এ কারণে যৌথ দরকষাকষিকে আর্থসামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে অভিহিত করা হয়।

৮। **যৌথ দরকষাকষি একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া:** যৌথ দরকষাকষি কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকপক্ষ ও মালিকপক্ষের মধ্যে সংঘটিত হয়। আলোচনায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণ নিজ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে। এই যৌথ দরকষাকষি প্রাতিষ্ঠানিক রীতি-নীতি মেনে করতে হয়। বাংলাদেশে বাংলদেশ শ্রম (সংশোধিত)আইন ২০১৩ -তে বিধৃত বিধান মেনে এই যৌথ দরকষাকষি করতে হয়। এ কারণে যৌথ দরকষাকষি একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া।

৯। **যৌথ দরকষাকষি নানা স্তরে হয়:** যৌথ দরকষাকষি নানা স্তরে হতে পারে। যেমন: কারখানা স্তরে, নির্দিষ্ট শিল্প স্তরে ও জাতীয় স্তরে যৌথ দরকষাকষি হতে পারে।

১০। **যৌথ দরকষাকষি একটা রাজনৈতিক মেকানিজম:** যৌথ দরকষাকষিকে একটা রাজনৈতিক প্রথা বা ব্যবস্থা হিসেবে দেখা হয়। এটি সম্পাদনের জন্য আইনকানুন, বিধিবিধান কারখানা পর্যায়ে ও জাতীয় পর্যায়ে প্রণয়ন করা হয় এবং সেগুলো অনুসরণ করে যৌথ দরকষাকষি করতে হয়। এ কারণে যৌথ দরকষাকষি একটা রাজনৈতিক মেকানিজম হিসেবে অভিহিত।

১১। **যৌথ দরকষাকষি একটি অবিরাম প্রক্রিয়া:** মালিক ও শ্রমিকদের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয় নানা সময় নানা রকম হয়। আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ,প্রযুক্তি ও বৈশ্বিক পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে মালিক ও শ্রমিকদের স্বার্থগত অবস্থারও পরিবর্তন হয়। তাই, যৌথ দরকষাকষি কালান্তরে চলতেই থাকে। একটা সমঝোতা চুক্তি হয় এবং সেটি নির্ধারিত কাল চলতে থাকে। নতুন পরিস্থিতি উদ্ভব হলে আবার যৌথ দরকষাকষি শুরু হয়। এ কারণে যৌথ দরকষাকষি একটি অবিরাম বা চলমান প্রক্রিয়া।

১২। **যৌথ দরকষাকষি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া:** যে প্রক্রিয়ায় পক্ষগণের মধ্যে তথ্য, ভাব, ধারণা ইত্যাদির আদান-প্রদান হয়, সেই প্রক্রিয়াকে দ্বিমুখী প্রক্রিয়া বলে। যৌথ দরকষাকষি তেমনই একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। এখানে মালিক ও শ্রমিকপক্ষ তাদের বিরোধের বিষয় নিয়ে তথ্যভিত্তিক, যুক্তিপূর্ণ, ন্যায়সংগত, গ্রহণযোগ্যতা, বাস্তবসম্মত ইত্যাদি বক্তব্যের আদান-প্রদান করে। ফলে, পক্ষগণ একটা গ্রহণযোগ্য সমাধানে আসতে পারে। এখানে কোনো এক পক্ষ সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারে না। এ জন্য যৌথ দরকষাকষি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া।

১৩। **যৌথ দরকষাকষি একটি সংযোগকারী মেকানিজম:** যৌথ দরকষাকষি ব্যবস্থা মালিকপক্ষ, শ্রমিকপক্ষ ও সরকার পক্ষের মধ্যে একটা সংযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। শিল্পে শান্তি ও দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখার জন্য সরকার ধর্মঘট ও কোনো বিশৃংখলা চায় না। সে কারণে সরকার যৌথ দরকষাকষিতে নজরদারি করে ও এ বিষয়ে আইন করে। এ প্রেক্ষাপটে, যৌথ দরকষাকষি সংযোগকারী মেকানিজম হিসেবে দেখা হয়।

১৪। **যৌথ দরকষাকষি একটি পরিপূরক প্রক্রিয়া:** যৌথ দরকষাকষি মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যে সংঘটিত হয়। এখানে পক্ষগণ পরস্পরের সঙ্গে শিল্প-বিরোধের বিষয় নিয়ে প্রতিযোগিতা করে না। বরং পরস্পরকে সহযোগিতা করে একটা গ্রহণযোগ্য সমাধানে আসতে চায়। এ কারণে যৌথ দরকষাকষি শিল্পে শান্তি আনার একটা পরিপূরক প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে।

এবার যৌথ দরকষাকষির আওতা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

যৌথ দরকষাকষির আওতা

Scope of Collective Bargaining

যে বিষয়গুলো নিয়ে প্রায়শ যৌথ দরকষাকষি হয়ে থাকে তা নিয়ে যৌথ দরকষাকষির আওতা নির্ধারিত হয়। সে প্রেক্ষাপটে দরকষাকষির আওতা হলো -

১। **আর্থিক বিষয়:** অর্থ সংক্রান্ত বিষয় হলো শিল্প-বিরোধের মূল বিষয়। তাই, মজুরি, বিভিন্ন ভাতা ও প্রণোদনার জন্য আর্থিক সুবিধা নিয়ে যৌথ দরকষাকষি হয়ে থাকে। সে কারণে আর্থিক বিষয় যৌথ দরকষাকষির আওতাভুক্ত।

২। **কাজের সময়:** কাজের শুরু ও সমাপ্তির সময়, ওভার টাইম, সাপ্তাহিক ও দৈনিক কার্যঘণ্টা ইত্যাদি বিষয় শ্রমিক ও মালিকপক্ষের যৌথ দরকষাকষির অন্যতম আওতাধীন বিষয়। এ বিষয়টি নিয়ে প্রায়ই শিল্প-বিরোধ দেখা দেয়। বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের কাজের সময় সংক্রান্ত নানা ইস্যু নিয়ে যৌথ দরকষাকষি হয়ে থাকে।

৩। **কার্যপরিবেশ:** শিল্প-সম্পর্কের অন্যতম বিষয় হলো কাজের পরিবেশ। কার্যপরিবেশ একটি বিস্তৃত বিষয়। কাজের পরিবেশের মধ্যে নিরাপত্তা, কল্যাণ, স্বাস্থ্য, ক্ষতিপূরণ, মানবিক আচরণ, সাম্য, অধিকার ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত। সে কারণে কার্যপরিবেশ যৌথ দরকষাকষির আওতায় পড়ে।

৪। **অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা:** প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ নিয়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের কোনো অসন্তোষ থাকলে তা অভিযোগ আকারে প্রকাশ পায়। অভিযোগ ঠিকমতো নিষ্পত্তি না হলে বা ভালোভাবে পরিচালনা করতে না পারলে তা শিল্প-বিরোধের কারণ হয় ও যৌথ দরকষাকষির বিষয় হয়ে পড়ে।

৫। **শ্রমবিষয়ক মানদণ্ড:** শ্রমিক নির্বাচন, কাজের পরিমাপ, পুরস্কার দেওয়া, উৎসাহ ভাতা দেওয়া, পদোন্নতি দেওয়া, শাস্তি দেওয়া ইত্যাদি বহু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার মানদন্ড প্রতিষ্ঠানে থাকে। এ সব মানদন্ড বৈষম্যমূলক, যথার্থ ও সন্তোষজনক না হলে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। এ কারণে শ্রমবিষয়ক মানদণ্ড যৌথ দরকষাকষির আওতায় পড়ে।

৬। **ইউনিয়ন-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক:** প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ইউনিয়ন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে নানা বিষয়ে যোগাযোগ, তথ্যের আদান-প্রদান, আলাপ-আলোচনা হয়। তাই, পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক ও আস্থাপূর্ণ সম্পর্ক থাকা দরকার। এই সম্পর্কের বিষয় যৌথ দরকষাকষির আওতায় পড়ে।

৭। **শ্রমিকদের অংশগ্রহণ:** সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ এখন সময়ের দাবি। নানা পদ্ধতিতে দেশে দেশে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কি পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ হবে এবং তার বিধিবিধান-কাঠামো কী হবে তা নির্ধারণ করার বিষয়টি যৌথ দরকষাকষির আওতায় পড়ে।

৮। **মানবাধিকার:** শ্রমিক-কর্মচারীদের মানবাধিকার যৌথ দরকষাকষির আওতাধীন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশের সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার ও জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সর্বজনীন মৌলিক মানবাধিকার প্রত্যেক শ্রমিক-কর্মচারীর স্বীকৃত অধিকার। এই অধিকার প্রতিপালনের ও রক্ষার বিষয়টি যৌথ দরকষাকষির আওতায় পড়ে।

এবার আলোচনা হবে যৌথ দরকষাকষির স্তর নিয়ে।

যৌথ দরকষাকষির স্তর

Levels of Collective Bargaining

যৌথ দরকষাকষি নানা পর্যায়ে বা স্তরে সংঘটিত হয়। সেগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো:

১। **প্রতিষ্ঠান স্তরে:** যে প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকরা কাজ করছে সে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা বা মালিকের সাথে শ্রমিকসংঘের যৌথ দরকষাকষি হয়ে থাকে। অধিকাংশ যৌথ দরকষাকষি প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে হয়।

২। **নির্দিষ্ট শিল্প স্তরে:** কোনো বিশেষ শিল্পের শ্রমিকদের সামগ্রিক সমস্যা নিয়ে শিল্প-বিরোধ দেখা দিতে পারে। তখন শ্রমিকসংঘ ফেডারেশন ও মালিক সমিতির মধ্যে যৌথ দরকষাকষি হয়। এটি শিল্প পর্যায়ে সংঘটিত যৌথ দরকষাকষি।

৩। **জাতীয় স্তরে:** শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ সমস্যা ও অধিকার নিয়ে জাতীয় শ্রমিকসংঘ ফেডারেশন শিল্প-বিরোধ উত্থাপন করলে ও জাতীয় পর্যাযে আন্দেলন করলে সমস্যাটি জাতীয় পর্যায়ে সমাধান করতে হয়ে। তখন জাতীয় শ্রমিকসংঘ

ফেডারেশন, মালিক সমিতি ফেডারেশন ও সরকার ত্রিপক্ষীয় যৌথ দরকষাকষি করার দরকার হয়। এটি জাতীয় স্তরে সংঘটিত যৌথ দরকষাকষি।

এবার আমরা যৌথ দরকষাকষি সফল হওয়ার শর্তাবলি আলোচনা করব।

যৌথ দরকষাকষি সফল হওয়ার শর্তাবলি

Conditions for Successful Collective Bargaining

শিল্প-বিরোধ মীমাংসার জন্য যৌথ দরকষাকষি একটা কার্যকর উপযুক্ত ব্যবস্থা। দেশে দেশে এই ব্যবস্থা চালু আছে। মালিক, শ্রমিক ও সরকার সকলেই শিল্পে শান্তি বজায় থাকুক ও উৎপাদন অব্যাহত থাকুক তা চায়। শিল্পে অশান্তি বা ধর্মঘট কেউ চায় না। সে জন্য সকল পক্ষই যৌথ দরকষাকষি পদ্ধতি ব্যবহার করে শিল্প-বিরোধ মীমাংসা করতে চায়। তবে যৌথ দরকষাকষির সাফল্য কতকগুলো শর্ত বা উপাদানের উপর নির্ভর করে। সে শর্তগুলো নিচে আলোচনা করা হলো-

১। **যোগ্য টিম:** যৌথ দরকষাকষির সাফল্যের জন্য দরকার দরকষাকষির একটি যোগ্য টিম। যৌথ দরকষাকষি কৌশলগত সংলাপ। শিল্প-বিরোধের পক্ষদের বিরোধী বিষয় সম্পর্কে যুক্তি, তথ্য, প্রমাণ ও পাল্টা যুক্তি, তথ্য, প্রমাণ সাবলিল ভাষায় ভদ্রভাবে যৌক্তিক ধারায় উপস্থাপন করতে হয়। এ জন্য যৌথ দরকষাকষিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান, ধৈর্য্য, নৈতিকতা, শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ও প্রজ্ঞা থাকা দরকার। উভয়পক্ষের তরফ থেকে যোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত টিম যৌথ দরকষাকষি করলে সাফল্য লাভ সহজ হয়।

২। **সংগঠন করার স্বাধীনতা:** যৌথ দরকষাকষি পদ্ধতির একটি অপরিহার্য শর্ত হলো সংগঠন অর্থাৎ, শ্রমিকসংঘ গঠনের স্বাধীনতা। যৌথ দরকষাকষিতে শ্রমিক ও মালিকদের প্রতিনিধি থাকে। শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করে যৌথ দরকষাকষি এজেন্ট। এই যৌথ দরকষাকষি এজেন্ট হলো শ্রমিকদের ভোটে নির্বাচিত একটি শ্রমিকসংঘ। এ কারণে প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকসংগঠন করার স্বাধীনতা থাকা দরকার। তা না হলে শ্রমিকসংঘ গঠন করা যাবে না ও যৌথ দরকষাকষি করা যাবে না।

৩। **সঠিক প্রতিনিধি:** যৌথ দরকষাকষি পদ্ধতির সাফল্য লাভের জন্য দরকার পক্ষদের সঠিক প্রতিনিধি। শ্রমিক ও মালিকদের প্রতিনিধি যৌথ দরকষাকষি করে। এই প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট পক্ষের স্বীকৃত প্রতিনিধি হতে হবে। তা না হলে তাদের দ্বারা কৃত চুক্তি অনেকে মানবে না। বিশেষ করে শ্রমিকদের প্রতিনিধি নির্বাচিত শ্রমিকসংঘ বা যৌথ দরকষাকষি এজেন্ট হতে হবে। আবার মালিকপক্ষের প্রতিনিধিও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ও কর্তৃত্বপ্রাপ্ত হতে হবে। যাহোক, সঠিক প্রতিনিধিরা যৌথ দরকষাকষি না করলে তা সফল হবে না।

৪। **পারস্পরিক স্বীকৃতি:** যৌথ দরকষাকষির সাফল্যতার আর একটি অপরিহার্য শর্ত হলো পারস্পরিক স্বীকৃতি। পক্ষগণ যৌথ দরকষাকষির টিমকে পরস্পর মেনে নেবে। তাদের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা গ্রহণ করবে। এই পারস্পরিক স্বীকৃতি না দিলে যৌথ দরকষাকষির সফলতা দূরে থাক, শুরুই করা যাবে না।

৫। **অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ:** যৌথ দরকষাকষি কার্যকরভাবে প্রচলন ও সাফল্যের জন্য অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ দরকার। যৌথ দরকষাকষি পদ্ধতি শিল্প-বিরোধ মীমাংসার হাতিয়ার হিসেবে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে স্বীকৃত হতে হবে। তা না হলে সরকারিভাবে প্রশাসনিক ও আইনগত সহায়তা পাওয়া যাবে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে সরকারি উদ্যোগে যৌথ দরকষাকষি পদ্ধতি নিশ্চিত করা হয়েছে। যাহোক, অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ না থাকলে যৌথ দরকষাকষি পদ্ধতি সফল হবে না।

৬। **চুক্তি পালনের বিশ্বাসযোগ্য অঙ্গীকার:** যৌথ দরকষাকষির সাফল্যের জন্য দরকার পক্ষগণের চুক্তি পালনের প্রতি বিশ্বাসযোগ্য অঙ্গীকার। সমঝোতা চুক্তির পর তা যদি পক্ষগণ বা কোনো এক পক্ষ তা পালন করবে না এই মর্মে অবিশ্বাস থাকে তা হলে যৌথ দরকষাকষি পদ্ধতি ব্যর্থ হবে। এ জন্য যৌথ দরকষাকষির সাফল্য পেতে হলে শিল্প-বিরোধের পক্ষগণ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় চুক্তি পালনের বিশ্বাসযোগ্য অঙ্গীকার ব্যক্ত করবে।

৭। **দেওয়া-নেওয়ার মানসিকতা:** যৌথ দরকষাকষির সাফল্যের জন্য পক্ষগণের মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে। শিল্প-বিরোধের বিষয় সম্পর্কে নিজ নিজ দাবি থেকে কিছু ছাড় দেওয়া ও অন্যের কিছু গ্রহণ করার

নমনীয় মানসিকতা থাকতে হবে। তা হলে সমঝোতামূলক চুক্তিতে উপনীত হওয়া যাবে। অনড় ও আপোশহীন ত্যাড়া মানসিকতা যৌথ দরকষাকষি ব্যর্থ করে।

৮। **অসৎ শ্রম আচরণ পরিহার:** যৌথ দরকষাকষির সাফল্যের জন্য পক্ষগণের অসৎ শ্রম আচরণ পরিহার করা আবশ্যিক শর্ত। বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধিত) আইন ২০১৩-তে মালিকের পক্ষে অসৎ শ্রম আচরণ (ধারা- ১৯৫) ও শ্রমিকের পক্ষে অসৎ শ্রম আচরণ (ধারা- ১৯৬) সম্পর্কে বর্ণনা আছে। এই অসৎ শ্রম আচরণ পরস্পরের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস তৈরি করে। ফলে, যৌথ দরকষাকষির অনুকূল ও সহায়ক পরিবেশ বিনষ্ট হয়। এ কারণে যৌথ দরকষাকষির সাফল্যের জন্য মালিক ও শ্রমিক উভয়পক্ষের অসৎ শ্রম আচরণ পরিহার করতে হবে।

৯। **কালান্তিক আলোচনা:** যৌথ দরকষাকষির সাফল্যের অন্যতম আবশ্যিক শর্ত হলো কালান্তর আলোচনা। কিছু কাল পর পর ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকসংঘ বা যৌথ দরকষাকষি এজেন্টদের শিল্পের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনাসভা করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। পূর্বে কৃত কোনো চুক্তির বাস্তবায়ন নিয়ে কোনো অভিযোগ বা অন্য কোনো উদ্ভূত বিষয় যা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে তা নিয়ে মুক্ত মনে আলোচনা করা হবে। এর ফলে যৌথ দরকষাকষির সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়ে।

১০। **যথেষ্ট প্রস্তুতি:** যৌথ দরকষাকষির সাফল্যের অন্যতম আবশ্যকীয় শর্ত হলো পক্ষগণের যৌথ দরকষাকষির জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি থাকতে হবে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যৌথ দরকষাকষি একটা কৌশলগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা। এখানে তথ্য ও প্রমাণ কথা বলে। আবেগ চলে না। তাই, পক্ষগণকে তাদের নিজেদের বক্তব্যের পক্ষে তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে, বক্তব্য পেশ করার একটা পরিকল্পনা করতে হবে; যুক্তি ও পালটা যুক্তির খসড়া প্রস্তুত করতে হবে এবং উপযুক্ত শব্দভাণ্ডার ও বাক্যবিন্যাসসহ ইত্যাদি বিষয় প্রস্তুত করতে হবে। এ রকম প্রস্তুতি যথেষ্ট নিলে যৌথ দরকষাকষি সফল হয়।

১১। **ধর্মঘট ও লকআউট শেষ অস্ত্র:** যৌথ দরকষাকষির সাফল্যের সর্বশেষ আবশ্যিক শর্ত হলো শেষ অস্ত্র আগে প্রয়োগ করা যাবে না। ধর্মঘট ও লক আউট শিল্প-বিরোধের শেষ অস্ত্র। এটি সবার শেষে অনান্যোপায় হয়ে ব্যবহার করতে হবে। সমঝোতার মাধ্যেমে চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য জোর চেষ্টা চালাতে হবে। শেষ বিকল্পের কথা চিন্তা করা যাবে না। তবেই যৌথ দরকষাকষির সাফল্য আসবে।

এবার আলোচ্য বিষয় হলো যৌথ দরকষাকষিতে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে।

যৌথ দরকষাকষিতে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া

Participation in Collective Bargaining Process

যৌথ দরকষাকষি একটা প্রক্রিয়া যা পর্যায়ক্রমে সম্পাদিত কতকগুলো কাজের সম্মিলনে গঠিত। যৌথ দরকষাকষিতে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ার ৬টি ধাপ রয়েছে। সেগুলো নিচে একে একে বর্ণনা করা হলো:

১। **যৌথ দরকষাকষি টিম গঠন (Team Formation for Collective Bargaining):** যৌথ দরকষাকষির পক্ষগণকে নিজ নিজ যৌথ দরকষাকষি টিম গঠন করতে হবে। দাবিদাওয়া পাওয়ার পর এই টিম গঠন করতে হবে। আগেই বলা হয়েছে যে, যৌথ দরকষাকষি একটি কৌশলগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা। এ জন্য যৌথ দরকষাকষিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান, ধৈর্য, শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ও প্রজ্ঞা থাকা দরকার। এ লক্ষ্যে উভয়পক্ষের তরফ থেকে যোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে যৌথ দরকষাকষি টিম গঠন করলে দরকষাকষি করা সহজ হয় ও তাতে সাফল্য আসে।

২। **যৌথ দরকষাকষির প্রস্তুতি গ্রহণ (Preparation for Collective Bargaining):** যৌথ দরকষাকষির প্রস্তুতি গ্রহণ পর্যায়ে পক্ষগণকে বিরোধের বিষয়; অপর পক্ষের শক্তি ও দুর্বলতা; যে কোনো সম্ভাব্য চুক্তির ব্যয়; প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা ও অনুমান করতে হবে। প্রত্যেক পক্ষকে তাদের নিজেদের বক্তব্যের পক্ষে তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে; বক্তব্য পেশ করার একটা পরিকল্পনা করতে হবে, যুক্তি ও পাল্টা যুক্তির খসড়া করতে হবে, উপযুক্ত শব্দভাণ্ডার ও বাক্যবিন্যাসসহ অন্যান্য বিষয় প্রস্তুত করতে হবে। এ রকম প্রস্তুতি নিলে যৌথ দরকষাকষি সফল হয়।

৩। **যৌথ দরকষাকষির পদ্ধতি স্থিরকরণ (Settling Negotiation Procedures for Collective Bargaining)**: এই পর্যায়ে যৌথ দরকষাকষির পদ্ধতি স্থির করতে হবে। উভয়পক্ষের পারস্পরিক সম্মতিতে আলোচনার বিভিন্ন বিষয় যেমন টিম সদস্য সংখ্যা, সময়, স্থান, আলোচ্যসূচি, আলোচনার ক্রমপর্যায়, কে আলোচনা শুরু করবে, কোনো মডারেটর থাকবে কিনা, আলোচনা খন্ডিত বিষয় নিয়ে হবে না, সামগ্রিক বিষয় নিয়ে হবে ইত্যাদি বিষয় নির্ধারণ করতে হবে। এটি পূর্ব থেকে স্থির করলে আলোচনা সাবলিলভাবে চলতে পারবে।

৪। **আলাপ-আলোচনা সম্পাদন (Negotiation for Collective Bargaining)**: এই পর্যায়ে বাস্তবে আলাপ-আলোচনা সংঘটিত হবে। এটি যৌথ দরকষাকষির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এ কাজের নির্দেশনা হচ্ছে পক্ষগণকে একে অপরের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে, পরস্পরের যুক্তি-তথ্য-প্রমাণ বুঝতে হবে ও এগুলোর নির্ভুলতা, ঘাটতি, অপর্যাপ্ততা, বাস্তবতা, অবাস্তবতা ইত্যাদি পরিমাপ করতে হবে, পালটা তথ্য-প্রমাণ-যুক্তি তুলে ধরতে হবে, সমঝোতার মনোভাব থাকতে হবে, পূর্বে স্থিরিকৃত বিধিবিধান মেনে চলতে হবে, এবং সৌজন্যতা বজায় রাখতে হবে। আলোচনায় পক্ষগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ও পারস্পরিক সুবিধাজনক সমাধান আনার চেষ্টা করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন হলে আলোচনার মাঝে বিরতি দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, আলোচনা ভেঙে গেলে কোনো পক্ষের জন্য তা শুভ হবে না।

৫। **যৌথ চুক্তিকরণ (Conducting Collective Agreement)**: যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে সমঝোতা হলে এবার যৌথ চুক্তি করতে হবে। চুক্তিতে সকল বিষয় স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট করে লিখতে হবে। উপযুক্ত দ্ব্যর্থহীন শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করতে হবে। পক্ষগণের সম্মতিতে চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করতে হবে ও পক্ষগণকে মুক্তমনে তাতে স্বাক্ষর করত হবে।

৬। **যৌথ চুক্তি বাস্তবায়ন (Administration of Collective Agreement)**: যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে অর্জিত সমাধান যৌথ চুক্তির শর্ত অনুসারে বাস্তবায়ন করতে হবে। এই বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে এবং মাঝে মাঝে পক্ষগণকে অগ্রগতি-পর্যালোচনা বৈঠক করতে হবে। এর ফলে সকলের কাছে দৃশ্যমানভাবে যৌথ চুক্তির বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে।

এইভাবে শ্রমিক ও মালিকপক্ষগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে যৌথ দরকষাকষি প্রক্রিয়া যা পর্যায়ক্রমে সম্পাদিত হয়। এবার যৌথ দরকষাকষির পন্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

যৌথ দরকষাকষির পন্থা

Ways of Collective Bargaining

যৌথ দরকষাকষির পন্থা পৃথিবীর সব দেশে একই রকম। বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধিত) আইন ২০১৩-তে যৌথ দরকষাকষির পন্থা সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই আইন অনুসারে বাংলাদেশে যৌথ দরকষাকষি নিয়ন্ত্রিত হয়। আমরা নিচে তা আলোচনা করব-

১। যদি কোনো সময়ে কোনো মালিক বা যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি বা এজেন্ট দেখতে পায় যে, মালিক বা শ্রমিকগণের মধ্যে কোনো বিরোধ উত্থিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তা হলে উক্ত মালিক বা যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি তার অভিমত ব্যক্ত করে অন্য পক্ষকে লিখিতভাবে জানাবেন। [ধারা-২১০(১)]

২। লিখিত পত্র প্রাপ্তির পনের দিনের মধ্যে পত্র-প্রাপক , অন্য পক্ষের সাথে পত্রে উত্থাপিত বিষয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে যৌথ দরকষাকষি শুরু করার জন্য তার সাথে একটি সভার ব্যবস্থা করবেন, এবং এইরূপ সভা এতদ্‌উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত উভয়পক্ষের প্রতিনিধির মধ্যেও অনুষ্ঠিত হতে পারবে। [ধারা-২১০(২)]

৩। যদি পক্ষগণ উক্তরূপ আলোচনার পর আলোচিত বিষয়ের উপর কোনো নিস্পত্তিতে উপনীত হন, তা হলে একটি নিস্পত্তিনামা লিখিত হবে এবং তাতে পক্ষদ্বয় দস্তখত করবেন এবং তার একটা কপি মালিক কর্তৃক সরকার , শ্রম পরিচালক এবং সালিশের (Conciliator) নিকট পাঠাতে হবে। [ধারা-২১০(৩)]

৪। যদি (ক) ধারা-২১০(১) এর অধীন প্রেরিত কোনো পত্রের প্রাপক অন্য পক্ষের সাথে ধারা- ২১০(২) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সভার ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়, তা হলে উক্ত অন্য পক্ষ, অথবা

(খ) উভয়পক্ষের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য অনুষ্ঠিত প্রথম সভার তারিখ হতে এক মাসের মধ্যে অথবা উভয়পক্ষের লিখিত সম্মতি অনুযায়ী বর্ধিত সময়ের মধ্যে কোনো নিষ্পত্তিতে উপনীত হওয়া না যায়, তা হলে যে কোনো পক্ষ উপ-ধারা ৯২ অথবা ক্ষেত্রমত, এই উপ-ধারার দফা (খ) এ উল্লিখিত সময়সীমা শেষ হওয়ার পর পনের দিনের মধ্যে তৎসম্পর্কে উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত উপযুক্ত সালিশকে অবহিত করতে পারবেন এবং বিরোধটি সালিশির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার জন্য তাকে লিখিতভাবে অনুরোধ করতে পারবেন। [ধারা-২১০(৪)]

৫। এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা,এতে উল্লিখিত কোনো নির্দিষ্ট এলাকা অথবা কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যার সালিশ নিযুক্ত করবে, এবং উপ-ধারা (৪) এর অধীন সালিশির জন্য কোনো অনুরোধ এই উপ-ধারার সংশ্লিষ্ট এলাকা বা প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের জন্য নিযুক্ত সালিশ গ্রহণ করবে। [ধারা-২১০(৫)]

৬। উক্ত লিখিত অনুরোধ পাওয়ার দশ দিনের মধ্যে সালিশ, তার সালিশি কার্যক্রম শুরু করবেন, এবং বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য উভয়পক্ষের সভা আহ্বান করবেন। [ধারা-২১০(৬)]

৭। বিরোধের পক্ষগণ স্বয়ং অথবা তাদের মনোনীত এবং উভয়পক্ষের মধ্যে অবশ্য পালনীয় চুক্তি সম্পাদন করতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে সালিশ এর নিকট তৎকর্তৃক নির্ধারিত তারিখে ও সময়ে হাজির হবেন। [ধারা-২১০(৭)]

৮। যদি সালিশির ফলে বিরোধ নিষ্পত্তি হয় তা হলে, সালিশ তৎসম্পর্কে সরকারের নিকট একটি রিপোর্ট পেশ করবেন, এবং এর সাথে উভয়পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত নিষ্পত্তিনামার একটি কপিও প্রেরিত হবে। [ধারা-২১০(৮)]

৯। যদি সালিশ কর্তৃক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে বিরোটি নিষ্পত্তি না হয়, তা হলে সালিশি কার্যক্রম ব্যর্থ হবে, অথবা উভয়পক্ষের লিখিত সম্মতিক্রমে আরও অধিক সময় চালানো যাবে। [ধারা-২১০(৯)]

১০। যদি সালিশি কার্যক্রম ব্যর্থ হয়, তা হলে সালিশ উভয়পক্ষকে বিরোধটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে তা কোনো মধ্যস্থতাকারীর (Arbitrator) নিকট প্রেরণ করার জন্য রাজি করানোর চেষ্টা করবেন। [ধারা-২১০(১০)]

১১। যদি পক্ষগণ বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য কোনো মধ্যস্থতাকারীর নিকট প্রেরণে রাজি না হন, তা হলে সালিশ, সালিশি কার্যক্রম ব্যর্থ হওয়ার তিন দিনের মধ্যে, তা ব্যর্থ হয়েছে এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র পক্ষগণকে প্রদান করবেন। [ধারা-২১০(১১)]

১২। যদি পক্ষগণ বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য কোনো মধ্যস্থতাকারীর নিকট প্রেরণ করতে রাজি হন, তা হলে তাদের সকলের স্বীকৃত কোনো মধ্যস্থতাকারীর নিকট বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য যৌথ অনুরোধ পত্র প্রেরণ করবেন। [ধারা-২১০(১২)]

১৩। উপ-ধারা (১২)-তে উল্লিখিত মধ্যস্থতাকারী সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত মধ্যস্থতাকারীর তালিকা হতে কোনো ব্যক্তি হতে পারবেন, অথবা পক্ষগণ কর্তৃক স্বীকৃত অন্য কোনো ব্যক্তি হতে পারবেন। [ধারা-২১০(১৩)]

১৪। মধ্যস্থতাকারী মধ্যস্থতার অনুরোধ পাওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে, অথবা পক্ষগণ কর্তৃক লিখিতভাবে স্বীকৃত কোনো বর্ধিত সময়ের মধ্যে তার রোয়েদাদ প্রদান করবেন। [ধারা-২১০(১৪)]

১৫। মধ্যস্থতাকারী তার রোয়েদাদ প্রদান করার পর এর একটি কপি পক্ষগণকে এবং আর একটি কপি সরকারের নিকট প্রেরণ করবেন। [ধারা-২১০(১৫)]

১৬। মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক প্রদত্ত রোয়েদাদ চূড়ান্ত হবে এবং এর বিরুদ্ধে কোনো আপীল করা চলবে না। [ধারা-২১০(১৬)]

১৭। মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক নির্ধারিত কোনো রোয়েদাদ অনধিক দুই বছর পর্যন্ত বৈধ থাকবে। [ধারা-২১০(১৭)]

১৮। শ্রম পরিচালক, কোনো নিষ্পত্তির স্বার্থে উপযুক্ত মনে করলে যে কোনো সময় কোনো সালিশ এর নিকট হতে কোনো সালিশ কার্যক্রম উঠিয়ে নিয়ে নিজে তা চালাতে পারবেন, অথবা অন্য কোনো সালিশ এর নিকট তা হস্তান্তর করতে পারবেন, এবং এ ক্ষেত্রে এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলি প্রযোজ্য হবে। [ধারা-২১০(১৮)]

১৯। যে পক্ষ কোনো শিল্প-বিরোধ উত্থাপন করে সে পক্ষ ধারা-২১০(১১) এর অধীন ব্যর্থতার প্রত্যয়নপত্র পাওয়ার তারিখ হতে পনের দিনের মধ্যে অন্য পক্ষকে ধর্মঘট অথবা, লকআউটের নোটিশ প্রদান করতে পারবে, যাতে নোটিশ প্রদানের পর অন্যূন সাত দিন এবং অনধিক চৌদ্দ দিনের মধ্যে কোনো তারিখ হতে তা শুরু হবে তা উল্লেখ থাকবে, অথবা উক্ত বিরোধ উত্থাপনকারী পক্ষ বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য শ্রম আদালতে দরখাস্ত করতে পারবে। [ধারা-২১১(১)]

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি ধর্মঘটের কোনো নোটিশ জারি করতে পারবে না, যদি না বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় সালিশের তত্ত্বাবধানে, এতদ্‌উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত কোনো গোপন ভোটের মাধ্যমে এর মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন তিন-চতুর্থাংশ সদস্য ধর্মঘটের পক্ষ তাদের রায় প্রদান করেন।

২০। যদি কোনো ধর্মঘট বা লকআউট শুরু হয়ে যায়, তা হলে বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য বিরোধে জড়িত যে কোনো পক্ষ শ্রম আদালতে দরখাস্ত পেশ করতে পারবে। [ধারা-২১১(২)]

২১। যদি কোনো ধর্মঘট বা লকআউট ত্রিশ দিনের বেশি স্থায়ী হয়, তা হলে সরকার, লিখিত আদেশ দ্বারা তা নিষিদ্ধ করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত ত্রিশ দিনের পূর্বে ও যে কোনো সময়ে, লিখিত আদেশ দ্বারা কোনো ধর্মঘট বা লকআউট নিষিদ্ধ করতে পারবে, যদি সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্তরূপ অব্যাহত ধর্মঘট বা লকআউট জনজীবনে সাংঘাতিক কষ্টের কারণ হয়েছে বা এটা জাতীয় স্বার্থের হানিকর। [ধারা-২১১(৩)]

২২। কোনো জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সরকার, এতে কোনো ধর্মঘট বা লকআউট শুরু হবার পূর্বে অথবা পরে যে কোনো সময়, লিখিত আদেশ দ্বারা তা নিষিদ্ধ করতে পারবে। [ধারা-২১১(৪)]

২৩। কোনো ক্ষেত্রে সরকার উপ-ধারা (৩) অথবা (৪) এর অধীন, এতে কোনো ধর্মঘট বা লকআউট কোনো ধর্মঘট বা লকআউট নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে সরকার তৎক্ষণাৎ বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য শ্রম আদালতে প্রেরণ করবে। [ধারা-২১১(৫)]

২৪। শ্রম আদালত বিরোধের উভয়পক্ষকে শুনানীর সুযোগ দিয়ে যথা শীঘ্র সম্ভব, বিরোধটি প্রেরণের তারিখ হতে অনধিক ষাট দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করে তার রোয়েদাদ প্রদান করবে। তবে শর্ত থাকে যে, শ্রম আদালত প্রয়োজনবোধে বিরোধিতা কোনো বিষয়ে অন্তবর্তী রোয়েদাদ প্রদান করতে পারবে। আরও শর্ত থাকে যে, রোয়েদাদ প্রদানে কোনো বিলম্বের কারণে রোয়েদাদ অবৈধ হবে না। [ধারা-২১১(৬)]

২৫। শ্রম-আদালতের কোনো রোয়েদাদ তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমা, যা দুই বছরের অধিক হবে না, পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। [ধারা-২১১(৭)]

২৬। যদি কোনো প্রতিষ্ঠান নতুন স্থাপিত হয়, অথবা বিদেশি মালিকানাধীন হয়, অথবা বিদেশি সহযোগিতায় স্থাপিত হয়, তা হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন শুরু হওয়ার পরবর্তী তিন বছর পর্যন্ত ধর্মঘট বা লকআউট নিষিদ্ধ থাকবে। তবে, উক্তরূপ প্রতিষ্ঠানে উত্থিত কোনো শিল্প-বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ে বর্ণিত অন্যান্য বিধান প্রযোজ্য হবে। [ধারা-২১১(৮)]

২৭। ধারা-২১০ এর অধীনে কোনো শিল্প-বিরোধ উত্থাপনকারী যদি (ক) ধারা-২১০(৪) এর অধীন এতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিরোধটি সালিশির মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য কোনো সালিশের নিকট অনুরোধ করতে ব্যর্থ হয়, অথবা (খ) ধারা- ২১১(১) এর অধীন জারিকৃত নোটিশে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ে ধর্মঘট বা লকআউট শুরু করতে ব্যর্থ হয়, অথবা (গ) ধারা- ২১১(১) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য শ্রম আদালতে প্রেরণ করতে, অথবা ধর্মঘট বা লকআউটের নোটিশ জারি করতে ব্যর্থ হয়, তা হলে শিল্প-বিরোধটি উক্তরূপ নির্ধারিত সময় বা তারিখের পর সমাপ্ত বা ক্ষান্ত হয়ে যাবে। [ধারা-২১২(১)]

২৮। যে ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো শিল্প-বিরোধ সমাপ্ত বা ক্ষান্ত হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে উক্ত সমাপ্তির বা ক্ষান্তির তারিখ হতে এক বছরের মধ্যে একই বিষয়ের উপর কোনো নতুন বিরোধ উত্থাপন করা যাবে না। [ধারা-২১২(২)]

২৯। কোনো যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি অথবা কোনো মালিক অথবা কোনো শ্রমিক এই আইন বা কোনো রোয়েদাদ বা কোনো নিষ্পত্তি বা চুক্তির অধীন বা দ্বারা নিশ্চিত কোনো অধিকার প্রয়োগের জন্য শ্রম আদালতে দরখাস্ত করতে পারবেন। [ধারা-২১৩]

৩০। শ্রম-আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোনো রায়, সিদ্ধান্ত, রোয়েদাদ,বা দণ্ডের বিরুদ্ধে কোনো সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত রায় প্রদানের ষাট দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করতে পারবে, এবং উক্তরূপ আপিলের ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে। [ধারা-২১৭]

৩১। ট্রাইব্যুনাল আপিলে শ্রম আদালতের কোনো রায়, সিদ্ধান্ত, রোয়েদাদ,বা দন্ডাদেশ বহাল রাখতে, সংশোধন বা পরিবর্তন করতে বা বাতিল করতে পারবে অথবা মামলাটি পুনরায় শুনানির জন্য শ্রম-আদালতে ফেরত পাঠাতে পারবে; এবং অন্যত্র ভিন্নরূপ কিছু না থাকলে, ট্রাইব্যুনাল এই আইনের অধীন প্রদত্ত শ্রম-আদালতের সকল ক্ষমতাও প্রয়োগ করবে। [ধারা-২১৮(১০)]

৩২। ট্রাইব্যুনালের রায় আপিল দায়ের করার অনধিক ষাট দিনের মধ্যে প্রদান করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোনো রায় কেবলমাত্র বিলম্বে প্রদানের কারণে অবৈধ হবে না। [ধারা-২১৮(১১)]

৩৩। ট্রাইব্যুনাল স্বেচ্ছায় অথবা কোনো পক্ষের দরখাস্তের পরিপেক্ষিতে কোনো মামলা এক শ্রম আদালত হতে অন্য শ্রম আদালতে হস্তান্তর করতে পারবে। [ধারা-২১৮(১৪)]

৩৪। যে সময় শিল্প-বিরোধ সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে সালিশি কার্যক্রম চলতে থাকে, অথবা তৎসংক্রান্ত কোনো মামলা শ্রম আদালতে চলতে থাকে, সে সময় বিরোধে জড়িত কোনো পক্ষ অন্য পক্ষের উপর ধর্মঘট বা লকআউটের কোনো নোটিশ জারি করতে পারবে না। [ধারা-২২৫]

৩৫। কোনো নিষ্পত্তি (ক) কোন বিরোধের পক্ষগণের মধ্যে সম্মত দিন থেকে বলবৎ হবে; (খ) যদি কোনো সম্মত দিন না থাকে তা হলে পক্ষগণ কর্তৃক নিষ্পত্তিনামা স্বাক্ষরের তারিখ হতে বলবৎ হবে। [ধারা-২২৩(১)]

৩৬। কোনো নিষ্পত্তি পক্ষগণ কর্তৃক সম্মত মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, এবং যদি এরূপ কোনো সম্মত মেয়াদ না থাকে , তা হলে উক্ত পক্ষগণ কর্তৃক নিষ্পত্তিনামা স্বাক্ষরের তারিখ হতে এক বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। [ধারা-২২৩(২)]

৩৭। উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও উক্ত নিষ্পত্তি পক্ষগণের উপর অবশ্য পালনীয় থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত 'নিষ্পত্তির দ্বারা তিনি আর বাধ্য থাকবেন না'- এই মর্মে কোনো পক্ষ অন্য কোনো পক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত না করেন, এবং উক্তরূপ অবহিতকরণের পর দুই মাস অতিবাহিত না হয়। [ধারা-২২৩(৩)]

৩৮। শ্রম আদালতের কোনো রোয়েদাদ, ট্রাইব্যুনালে তার বিরুদ্ধে কোনো আপীল দায়ের করা না হলে, উক্ত আদালত কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ হতে তা কার্যকর হবে এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদ, যা দুই বছরের অধিক হবে না, পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। [ধারা-২২৩(৪)]

৩৯। মধ্যস্থতাকারী, শ্রম আদালত অথবা ক্ষেত্রমতো, ট্রাইব্যুনাল কোনো রোয়েদাদের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দাবি কোন কোন তারিখ হতে বলবৎ হবে এবং কোন কোন সময়সীমার মধ্যে এর প্রত্যেকটি কার্যকর করতে হবে, তা নির্ধারণ করে দেবে। [ধারা-২২৩(৫)]

৪০। কোন রোয়েদাদ সংক্রান্ত আপীল প্রদত্ত ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত রোয়েদাদের তারিখ হতে বলবৎ হবে। [ধারা-২২৩(৭)]

এবার আমরা যৌথ দরকষাকষি এজেন্ট বা প্রতিনিধির কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করব।

যৌথ দরকষাকষি এজেন্টে বা প্রতিনিধির কার্যাবলি

Functions of Collective Bargaining Agent

বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধিত) আইন ২০১৮ -এর ধারা ২(৫২) অনুসারে যৌথ দরকষাকষির এজেন্ট বা প্রতিনিধি অর্থ কোনো প্রতিষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের এমন কোনো শ্রমিকসংঘ বা ট্রেড ইউনিয়ন বা ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন বা শ্রমিকসংঘ ফেডারেশন, যা ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অধীন উক্ত প্রতিষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে যৌথ দরকষাকষির ব্যাপারে শ্রমিকদের প্রতিনিধি।

অত্র আইনের ধারা ২০২(১) অনুসারে যে ক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠানে একটি মাত্র ট্রেড ইউনিয়ন থাকে সে ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য এটি যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি বলে গণ্য হবে। তবে, যে ক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠানে একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন থাকে, তবে অত্র আইনের বিধি অনুসারে শ্রমিকদের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত ট্রেড ইউনিয়ন যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি বলে গণ্য হবে।

অত্র আইনের ধারা-২০২(২৪)-অনুযায়ী যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি কতকগুলো কাজ করার অধিকারী। এই আইন বলে অর্পিত কাজগুলো হলো-

১। শ্রমিকদের চাকুরি না থাকা, চাকুরির শর্তাবলি অথবা কাজের পরিবেশ সম্মন্ধে মালিকের সঙ্গে দরকষাকষি করা;

২। যে কোনো কার্যধারায় সকল বা যে কোনো শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব করা;

৩। এই অধ্যায়ের বিধান অনুযায়ী ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়া, এবং তা ঘোষণা করা;

৪। কোনো কল্যাণ প্রতিষ্ঠানে অথবা ভবিষ্যত তহবিলে এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ের অধীন প্রতিষ্ঠিত শ্রমিকগণের অংশগ্রহণ তহবিলের ট্রাষ্টি বোর্ডে শ্রমিকগণের প্রতিনিধি মনোনয়ন করা;

৫। এই আইনের আওতায় কোনো একক ও দলবদ্ধ শ্রমিকের পক্ষে মামলা পরিচালনা করা।

এবার বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান যৌথ দরকষাকষি ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

বিভিন্ন দেশে যৌথ দরকষাকষি

Collective Bargaining in Different Countries

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান যৌথ দরকষাকষি ব্যবস্থা প্রায় একই রকম। আমরা নিচে কয়েকটি দেশের যৌথ দরকষাকষি ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করব।

ইউরোপের দেশসমূহ

ইউরোপের দেশসমূহে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে যৌথ দরকষাকষি হয়ে থাকে। জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন শ্রমজীবী মানুষের সার্বিক মজুরি ও সুবিধা নিয়ে সরকারের সাথে দেনদরবার করার জন্য যৌথ দরকষাকষি করে থাকে। তবে, ২০১১ সালে রোমানিয়া জাতীয় পর্যায়ে যৌথ দরকষাকষি নিষিদ্ধ করেছে। এ সব দেশে ৭৫ শতাংশের বেশি শ্রমিক ইউনিয়নভুক্ত। অধিকাংশ দেশে কোম্পানি পর্যায়ে যৌথ দরকষাকষি হয়ে থাকে। শ্রমিকদের মজুরি, নিরাপত্তা,আবাসন, পরিবহণ, কল্যাণমূলক কর্মসূচি, অবসর ভাতা, বীমা সুবিধা, উৎসাহ ভাতা. সর্বনিম্ন মজুরি, স্বাস্থ্য সেবা, ন্যায়বিচার, বৈষম্যহীন আচরণ, মানবাধিকার ইত্যাদি শ্রমিক স্বার্থ ও নিয়োগ শর্ত নিয়ে যৌথ দরকষাকষি হয়ে থাকে। রাষ্ট্রীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় থাকায় অনেক শ্রমিক স্বার্থ ও কল্যাণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও আইন অনুসারে ব্যবস্থাপনাকে রক্ষা করতে হয়। অনেক দেশে জাতীয় বা খাতভিত্তিক যৌথ দরকষাকষি চুক্তি সম্পাদিত হয়। যুক্তরাজ্যেসহ অনেক দেশে সামাজিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে শ্রমিক ইউনিয়ন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে যৌথ দরকষাকষি হয়ে থাকে। ইউরোপের অধিকাংশ দেশে জাতীয় ফ্রেমওয়ার্ক অনুসারে শ্রমিকদের মজুরি ও অনেক সুযোগ-সুবিধা নির্ধারিত হয়। ফলে, এগুলো নিয়ে যৌথ দরকষাকষির আর প্রয়োজন পড়ে না।

কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র

কানাডাও যুক্তরাষ্ট্রে শক্তিশালী আইন দিয়ে যৌথ দরকষাকষি নিয়ন্ত্রিত হয়। এই আইন যৌথ দরকষাকষি সম্পর্ক গঠন, যৌথ দরকষাকষির সময় ও কার্যপ্রক্রিয়া, অর্থনৈতিক বিরোধের উপর বিধিনিষেধ এবং অনেক ক্ষেত্রে যৌথ দরকষাকষির কতিপয় শর্ত নির্ধারণ করে দেয়। একটি শ্রম সম্পর্ক বোর্ড শিল্প-সম্পর্কের বিষয়গুলো দেখভালো করে। আইন অনুসারে শ্রম ট্রাইব্যুনাল আছে এবং এই শ্রম ট্রাইব্যুনাল শ্রম সম্পর্ক বোর্ডের কাজের উপর যথেষ্ট ক্ষমতাবান। এই শ্রম ট্রাইবুনাল শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার শিল্প-সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, ব্যবস্থাপনাকে ইউনিয়নের উপর হস্তক্ষেপ থেকে বিরত রাখে ও শ্রমিক ইউনিয়নের অসময়ে ডাকা ধর্মঘট পালন করা থেকে বিরত করতে পারে। এখানে শিল্প-সম্পর্কের ক্ষেত্রে ফেডারেল ও স্টেট সরকারের মধ্যে আইন প্রণয়ন ও পরিচালনার কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের বিভাজন আছে। এ সব দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ বেসরকারি শ্রমিক-কর্মচারী স্টেট বা প্রাদেশিক সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অন্যান্য বিষয়সমূহ ইউরোপের দেশসমূহের মতো হয়ে থাকে।

এশিয়ার দেশসমূহ

এশিয়ার দেশসমূহ ব্রিটেনের কলোনি ছিল। ফলে, শিল্প-সম্পর্ক সম্পর্কিত কলোনিয়াল আইনকানুন, বিধিবিধান অনুসারে এসব দেশে বলবৎ আছে। নতুন কিছু কিছু মানবাধিকার ও সাংবিধানিক অধিকারসহ কিছু গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংযোজন - বিয়োজন করা হয়েছে। শিল্প-সম্পর্ক আধুনিকীকরণের জন্য এই পরিবর্তন করা হয়েছে। এ কারণে এশিয়ার দেশসমূহে বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধিত) আইন ২০১৩-এ যৌথ দরকষাকষির পন্থা সম্পর্কে যে ধারাবাহিক বিধি আছে, তা-ই চালু আছে। তবে, যে সব দেশে গণতান্ত্রিক সরকার নেই, সেখানে কিছু স্বৈরতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ আছে।

যৌথ দরকষাকষির বর্তমান ধারা

Current Trend of Collective Bargaining

বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে জনগণ সোচ্চার। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও সমতা ভিত্তিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার দাবি প্রবল। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য বাধ্যতামূলক হওয়ায় শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা, কল্যাণ ও অধিকার সংরক্ষণ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষিতে দেশে দেশে যৌথ দরকষাকষির গণতান্ত্রিক ধারা বজায় রাখার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশে প্রচলিত যৌথ দরকষাকষির পদ্ধতি পৃথিবীর অনেক দেশে চালু আছে। উন্নত দেশসমূহে আরও গণতান্ত্রিক ও অংশগ্রহণমূলক যৌথ দরকষাকষির পদ্ধতি চালু আছে। তবে, গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার ভিত্তিক উন্নত আরও মানবিক ও পরিবেশ বান্ধব শিল্প-সম্পর্ক ও যৌথ দরকষাকষি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

সারসংক্ষেপ

যৌথ দরকষাকষি শিল্প-বিরোধ নিষ্পত্তি করার অন্যতম পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি অর্থাৎ যৌথ দরকষাকষি এজেন্ট বা শ্রমিকসংঘ শ্রমিকদের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে আসে। যৌথ দরকষাকষি হলো একজন নিয়োগকারী বা একদল নিয়োগকারী ও একদল কর্মীর মধ্যে কাজের পরিবেশ নিয়ে একটা চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য আলাপ-আলোচনা। যৌথ দরকষাকষি একটা বিশেষায়িত কাজ। এ জন্য এই যৌথ দরকষাকষির কতকগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। যে বিষয়গুলো নিয়ে প্রায়শঃ যৌথ দরকষাকষি হয়ে থাকে তা নিয়ে যৌথ দরকষাকষির আওতা নির্ধারিত হয়। সে প্রেক্ষাপটে দরকষাকষির আওতা হলো- আর্থিক বিষয়, কাজের সময়, কার্যপরিবেশ,অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা, শ্রমবিষয়ক মানদণ্ড, ইউনিয়ন ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক, শ্রমিকদের অংশগ্রহণ এবং মানবাধিকার। যৌথ দরকষাকষির তিনটি স্তরে সম্পাদিত হতে পারে যেমনঃ প্রতিষ্ঠান স্তরে, নির্দিষ্ট শিল্প স্তরে, জাতীয় স্তরে সম্পাদিত হতে পারে। যৌথ দরকষাকষি সফল হওয়ার শর্তাবলির মধ্যে যোগ্য টিম, সংগঠন করার স্বাধীনতা, সঠিক প্রতিনিধি, পারস্পরিক স্বীকৃতি, অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ ইত্যাদি প্রধান। যৌথ দরকষাকষিতে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ার ক্রমপর্যায় হলোঃ যৌথ দরকষাকষি টিম গঠন -যৌথ দরকষাকষির প্রস্তুতি গ্রহণ-যৌথ দরকষাকষির পদ্ধতি স্থিরীকরণ; আলাপ-আলোচনা সম্পাদন এবং যৌথ চুক্তিকরণ-যৌথ চুক্তি বাস্তবায়ন। এইভাবে শ্রমিক ও মালিকপক্ষগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে যৌথ দরকষাকষি প্রক্রিয়া যা পর্যায়ক্রমিক সম্পাদিত হয়। যৌথ দরকষাকষির পন্থা পৃথিবীর সব দেশে একই রকম। বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধিত) আইন ২০১৩ -তে যৌথ দরকষাকষির পন্থা সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই আইন অনুসারে বাংলাদেশে যৌথ দরকষাকষি নিয়ন্ত্রিত হয়। যৌথ দরকষাকষি এজেন্টের বা প্রতিনিধি শ্রম স্বার্থ ও অধিকার নিয়ে কাজ করে। বিভিন্ন দেশে যৌথ দরকষাকষি কীভাবে করা হয় তার বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট মূল্যায়ন

১। যৌথ দরকষাকষি কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করুন।
২। যৌথ দরকষাকষির আওতা বর্ণনা করুন।
৩। যৌথ দরকষাকষির পর্যায়গুলো বর্ণনা করুন।
৪। যৌথ দরকষাকষির বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
৫। যৌথ দরকষাকষি সফল করার শর্তাবলি বর্ণনা করুন।
৬। যৌথ দরকষাকষিতে অংশগ্রহণ কীভাবে করতে হবে তা বর্ণনা করুন।
৭। যৌথ দরকষাকষির পন্থা বর্ণনা করুন।
৮। যৌথ দরকষাকষি এজেন্টের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করুন।
৯। বিভিন্ন দেশের যৌথ দরকষাকষি সম্পর্কে আলোচনা করুন।
১০। যৌথ দরকষাকষির বর্তমান ধারা বর্ণনা করুন।